Vol. 43 | No. 1 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সামন্ত সমাজে রুদ্র নারী : বসন্তকুমারীর রেবতী

Volume	43
Issue	1
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফেরদৌসী খান
Published online	October 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v43i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i1.9
Pages	135-143
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সামন্ত সমাজে রুদ্র নারী : বসন্তকুমারীর রেবতী

ফেরদৌসী খান*

জনপ্রিয় অবস্থানে ও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে আজ যে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে তার অবয়বটি সকল সময়ে এরকম ছিল তা ভাববার অবকাশ নেই। অথবা একথাও মনে করার কারণ নেই যে, বাংলা নাটকের সূচনা ১৭৯৫ সালে লিয়েবেদফের হাতে, কিংবা ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবেই বাংলা নাটকের জন্ম। লিয়েবেদফ বা ইংরেজ শাসনের গুরুত্ব বাংলা নাটকে যে বিপুল তা অস্বীকার করা যায় না। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্যসহ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহিত্যকর্মেই নাটকের উপাদান পাওয়া যায়। তবে অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটক লেখা হয়েছিল কিনা, তা আজও জানা যায়নি। যদিও আদি নিদর্শন চর্যাপদে বুদ্ধ নাটকের উল্লেখ আছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা নাটকের সূচনা হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। রুশ দেশীয় যুবক গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদফ -

> কলকাতার ডুমতলায় বর্তমান এজরা স্ট্রীটে বেঙ্গলী থিয়েটার নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করলেন। ... তাঁর ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সাহায্যে তিনি দু'টি ইংরেজী প্রহসন বাংলাতে অনুবাদ করেন The disguise এবং Love is the best Doctor। তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের শিক্ষা ও রুচি অনুসরণ করে তিনি অনূদিত নাটক দুটিতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা থেকে অনেক গান দিয়েছিলেন।[১]

লিয়েবেদফের পর বাংলা নাটকে দীর্ঘ বিরতি লক্ষ করা যায়। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল রহস্যময় বিরতির পর পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হন হরচন্দ্র ঘোষ, যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখ। বাংলা নাটকের উন্মেষকালের এ নাট্যকারগণ নাটক রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন তেমনি বাংলা নাটকের সম্ভাবনাময় দিগন্তকে উন্মোচিত করেছেন। তবে এদের নাটকে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সুকঠিন নির্বন্ধ থাকায় এবং প্রতিভার সীমাবদ্ধতাজনিত বিন্যাস শিথিলতায় বাংলা নাটকের প্রবাহ মন্থর হয়ে যায়। এসময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবলী*র (১৮৫৮) ইংরেজি তরজমা করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। উপস্থিত ইংরেজ দর্শকদের সুবিধার্থে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের ম্লানদশা দেখে আহত হয়ে নাটক রচনায় উৎসাহ বোধ করেছিলেন। যে কারণে তাঁর হাতে জন্ম নেয় *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯), *পদ্মাবতী*

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কলেজ।

(১৮৬০), *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১) ইত্যাদি। ফলে বাংলা নাটক তাঁর কৃতিত্বে নতুন পথের সন্ধান লাভ করে। আর নবীন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর মধুসূদনের নাটক বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় কীর্তিতে রূপান্তরিত হয়। এরপর বাংলা নাটক নতুন পথে নানান বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত হয়ে প্রবল গতিতে অগ্রসর হয়।

নাটক রচনার প্রখর খরারকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর মধুসূদন প্রদর্শিত পথে পা বাড়ান দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন বসু। দু-জনের সৃষ্টিসম্ভারে স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য থাকলেও নবীন পথকে সমৃদ্ধ করায় তাঁদের অবদান কম নয়। বিশেষ করে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান অপরিসীম।

> সমাজ সচেতনতা দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের বিশিষ্টতা। দীনবন্ধু মিত্রের পূর্বেই আমরা অবশ্য সমাজসচেতন নাটকের পরিচয় পেয়েছি। যেমন কৌলিন্য প্রথা, বাল্য বিবাহ প্রথা, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে ব্যঙ্গাত্মক রচনার পরিচয় এর পূর্বেই আমরা পেয়েছি। রামনারায়ণের কৌলিন্য প্রথা অবলম্বনে রচিত 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক, বিধবা বিবাহ অবলম্বনে রচিত উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক, বহু বিবাহ অবলম্বনে তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী' নাটক; এ সমস্ত নাটক সমাজসচেতনতার পরিচয় বহন করেছে। কিন্তু এগুলোর কোনটাই সামাজিকতাকে অতিক্রম করে সর্বজনীন মানববোধকে অবলম্বন করতে পারেনি। সমসাময়িক সমাজের গ্লানি এবং বিচ্যুতিকে অবলম্বন করে এগুলো রচিত কিন্তু এ সমস্ত বিচ্যুতির মধ্যেও আনন্দ, দুঃখ, দৈন্য, সর্বনাশ ও সমৃদ্ধির মধ্যে যে মানুষ কালাতিপাত করে তার পরিচয় এগুলোতে নেই। দীনবন্ধু মিত্রই সর্বপ্রথম সামাজিক সমস্যার মধ্যে জীবন এবং মানব চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন।[২]

এ সকল হিন্দু নাট্যকার যখন বাংলা নাটকে উচ্চকিত তখনও মুসলমান নাট্যকার বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত। মুসলমানদের এই অনুপস্থিতি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অপহৃত হলে এবং কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, ধীরে ধীরে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও লুপ্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া ইংরেজ বৈরিতা ও কুসংস্কার মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা-বিমুখ করে রাখে। ফলে তারা হিন্দু অপেক্ষা পিছিয়ে পড়ে। এই পশ্চাৎপদ মুসলমানদের মধ্যে বোধোদয় হয় যখন, তখন হিন্দুরা অগ্রসর হয়ে গেছে অনেক দূর। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে যাওয়া মুসলমানদের মধ্যে নাট্যকারের আবির্ভাবও তাই বিলম্বিত হয়।

তাই দেখা যায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুসলমান নাট্যকার ও তাদের লেখা নাটক পাওয়া যায় না। অদ্যাবধি প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গোলাম হোসেনই প্রথম মুসলমান নাট্যকার এবং তাঁর *হাড়জ্বালানীই* (১৮৬৪) মুসলমান রচিত প্রথম নাটক। শিল্পমূল্য শূন্য *হাড়জ্বালানী* ঐতিহাসিক মূল্যের কারণেই কেবল আলোচিত। *হাড়জ্বালানীর* সমসাময়িক কালে রচিত হয় শেখ আজিমদ্দীর *কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে* প্রহসন। এটিও শিল্পমূল্যে বিশেষত্বহীন। এদের পর আবির্ভূত হলেও বস্তুত মীর মশাররফ হোসেনই (১৮৪৭-১৯১২) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মুসলমান নাট্যকার। তাঁর *বসন্তকুমারী* (১৮৭৩) দিয়েই বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নাট্যকারের সার্থক নাটক রচনার সূত্রপাত।

মীর মশাররফ হোসেন যখন নাট্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তখন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এবং তারা সমাজ অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল শক্তিরূপে আবির্ভূত। এই শ্রেণীর মধ্যে ছিল নানান মাত্রা। পুরাতন সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাসের মূলে এরা আঘাত করেছিল। এদের আঘাতে সনাতন ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক আস্থার শক্ত বাঁধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যেতে থাকে।

শিথিলবদ্ধ সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, ভারতে বৃটিশ শাসনের সূত্র ধরে। কারণ তাদের আবির্ভাব বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করে। মনীষী কার্ল মার্কস আবহমানকালের ভারতীয় সমাজ ধারণার আমূল পরিবর্তনের জন্যে বৃটিশ শাসনকেই চিহ্নিত করেছেন। মূলত দেওয়ানি লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ, লুণ্ঠন ও রাজস্ব আদায়ের জন্যে অত্যাচার এই তিনের ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে অভিহিত করা হয়। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করে।

এই মন্বন্তরের ভয়াবহতায় আক্রান্ত হয়েছিল কোম্পানি সরকারও। তাই তারা জন্ম দেয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) নামের এক আইনি দানবের। এই প্রথা বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ভূমির উত্তরাধিকার জমিদার কর্তৃক পীড়নের মাত্রা যেমন বৃদ্ধি করে তেমনি নব্য সৃষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী, বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে। সদ্যজাত সামন্তশ্রেণী ভোগবিলাসে ও নিষ্ঠুরতায় ব্যয় করে কষ্টহীন উপার্জন। ফলে বাংলায় সম্ভাবনাময় শিল্পপুঁজি বিকশিত হয় না। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ওপরই ভরসা করতে হয়। যে কারণে ব্রিটেনের শিল্পকারখানার কাঁচামালের উৎস হয়ে ওঠে বাংলা এবং অনিবার্য কারণে এখানে নীল চাষের সূচনা হয়।

> নীল চাষ বাংলার অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। অধিক মুনাফার লোভে নীলচাষের নামে কৃষকের উপর ইংরেজ নীলকরের অমানুষিক পীড়ন-অত্যাচার কৃষক প্রজার জীবন দুর্বিসহ ও অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল।[৩]

বিপন্ন কৃষকের দ্রোহ প্রশমনের স্বার্থে ও নব্য বিকশিত মধ্যবিত্তের প্রয়োজনে ইংরেজ যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার সুবিধা লাভ করে হিন্দুরা। এই নবীন আলোয় আলোকিত শ্রেণীই সমাজ সংস্কারের পথে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকে মুসলমানরা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ও ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা প্রসারের সুফল তারা ভোগ করতে পারেনা। তাদের ধর্মীয় সংস্কার ও অন্ধত্বে, ইংরেজ প্রশ্নে ঐতিহাসিক বিদ্বেষ, নগদ অর্থের অভাব, মুসলমান নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ইত্যাদি সুফল লাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশও বিলম্বিত হয়। মীর মশাররফ হোসেন যখন সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তখন নব্য বিকশিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান মধ্যবিত্ত অস্তিত্বশূন্য। সামন্ত সমাজের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু প্রবণতা প্রবল। মানবিকতা ও মূল্যবোধ বাঙালি সমাজে কৃশাঙ্গ। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসমভাবে বিকশিত হিন্দু-মুসলমানের বৈরিতা, অবক্ষয়ের প্রান্তসীমায় উপনীত জমিদার শ্রেণী, মূল্যবোধ বর্জিত বঙ্গীয় সমাজ, দারিদ্র্য পীড়িত কৃষক সম্প্রদায়, ইংরেজদের সদ্যজাত দালাল গোষ্ঠী ইত্যাদির সমন্বয়ে বর্ধিত বাংলাদেশ মীর মশাররফ হোসেনের নাটক ও প্রহসনের উন্মেষভূমি। সে ভূমিতে লালিত পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজ তাঁর সৃষ্টির আশ্রয়। তবে আশ্রিত মুসলমান সম্প্রদায় কখনোই তাঁর কাছে অবাঞ্ছিত প্রশ্রয় পায়নি। স্বধর্মের অসুস্থতা, সামন্ত শ্রেণীর অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ ও সমকালের নিষ্ঠুর সত্য ভাষণই মীর মশাররফের সাহিত্যে নির্মোহভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর এখানেই তাঁর সাফল্য ও স্বাতন্ত্র্য।

মীর মশাররফ হোসেনের নাটক ও প্রহসন মূল্যায়নে যেমন সমকাল বিবেচনার দাবি রাখে তেমনি তাঁর মানস বিশ্লেষণে জন্মভূমিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান।

> মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম এমন এক অঞ্চলে, যার স্থানিক গুরুত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুবিদিত। মশাররফের জন্মভূমি লাহিনীপাড়া, কুমারখালী ও কুষ্টিয়ার মধ্যবর্তী একটি গ্রাম। ... লাহিনীপাড়াকে কেন্দ্রবিন্দু কল্পনা করে একটি বৃত্ত রচনা করলে দেখা যাবে, সন্নিহিত কুমারখালীতে জন্ম নিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্য-সাধক, নির্ভীক সাংবাদিক ও প্রজাদরদী কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)। হরিনাথকে কেন্দ্র করে কুমারখালীতে গড়ে ওঠে এক কাঙাল-মণ্ডলী। সাহিত্যিক রায়বাহাদুর জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯), তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্নব (১৮৬০-১৯১৩), ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) ছিলেন সেই কাঙাল-মণ্ডলীর কীর্তিমান সদস্য। মরমিয়া সাধনার ক্ষেত্রভূমি কুমারখালী থানার অন্তর্গত ভাঁড়ারা ও লাহিনীপাড়া সংলগ্ন ছেঁউড়িয়া গ্রাম বাউল শ্রেষ্ঠ লালন সাঁইয়ের (১৭৭৪-১৮৯০) যথাক্রমে জন্মস্থান ও সাধনক্ষেত্র। কুমারখালী সংলগ্ন খোকসার জানিপুরে জন্মেছিলেন সেকালের বিখ্যাত কীর্তনিয়া রবীন্দ্র নন্দিত শিবনাথ সাহা (শিবু সাহা)। এর অদূরে হিজলাবট গ্রামে ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতৃপুরুষ শিক্ষাবিদ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের (১৮৫৭-১৯৩৮) জন্ম। শিলাইদহে আবির্ভূত হয়েছিলেন বাউল কবি গগন হরকরা (১৮৫০-১৯১০), গোঁসাই রামলাল (১৮৪৬-১৮৯৪) ও গোঁসাই গোপালের (১৮৬৯-১৯১২) মতো মরমী ব্যক্তিত্ব। শিলাইদহে জমিদারি সূত্রে এ অঞ্চলের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রচিত হয়। মূলত দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও প্রযত্নে কুমারখালী কুষ্টিয়া অঞ্চলে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সূত্রে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯৯), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতার সঙ্গে এই অঞ্চলের একটি যোগাযোগ গড়ে ওঠে।
>
> ইংরেজ পরিচালিত রেশমকুঠি ও ৫১টি নীলকুঠির হেড অফিস কুমারখালী এবং সংলগ্ন এলাকা ছিলো নীল চাষের একটি প্রধান অঞ্চল। মীরের স্মৃতি-শ্রুতিতে নীলচাষ নীলকুঠিয়াল-নীল বিদ্রোহের কথা ও কাহিনী ছিলো উজ্জ্বল। লাহিনীপাড়া সংলগ্ন গড়াই নদীর ওপরে রেলসেতু নির্মাণের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে অস্থায়ী ফিরিঙ্গি-বসতি। এইভাবে ফিরিঙ্গি - সংস্কৃতির সঙ্গেও এই অঞ্চলের মানুষের একটি ক্ষীণ-পরিচয় সাধিত হয়। বর্ণিত কুষ্টিয়া-কুমারখালীর ঐতিহ্যগত সারস্বত সাধনার এই কেন্দ্রীয় ভূমিতেই মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব।[৪]

এই সকল উদার মনীষীর জন্মভূমির আবহও ছিল তাঁদের মানসিকতার মত। তাই দেখা যায় মীর মশাররফ হোসেনের রচনায় তাঁর জন্মভূমির ঔদার্য। পূর্বোক্ত মনীষীদের প্রজ্ঞার প্রতিফলন তাঁর মানসে। মীর সাহেব রচিত প্রথম নাটক *বসন্তকুমারী নাটক*ই যথার্থ প্রমাণ।

বসন্তকুমারী নাটক মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম নাটক ও তৃতীয় গ্রন্থ। কলিকাতা থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হবার প্রায় ১৪ বছর পর ময়মনসিংহ থেকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর প্রায় একশত বছর পরে চট্টগ্রাম থেকে ড. আবদুল আউয়াল ভূমিকা সংযোজিত করে তা পুনঃপ্রকাশ করেন।

> অতঃপর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাস্থ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ড. কাজী আবদুল মান্নান তাঁর মশাররফ রচনা-সম্ভারের প্রথম খণ্ডে এর দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ করেন। এই নাটকের প্রথম সংস্করণ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু অতিরিক্ত দৃশ্য আছে এবং প্রথম সংস্করণের 'মামদো' চরিত্রটি দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে। বসন্তকুমারী নাটকের ভূমিকায়

মশাররফ হোসেন একে অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকাশের তারিখ অনুসারে এটি তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ। কারণ এ নাটক প্রকাশের একমাস পূর্বে 'গোরাই ব্রিজ' প্রকাশিত হয়। এমনও হতে পারে 'গোরাই ব্রিজ' রচনার আগেই তিনি বসন্তকুমারী রচনা শেষ করেছিলেন, ছাপা হয়েছে পরে। অথবা ১২৭ পৃষ্ঠার বসন্তকুমারী নাটকের মুদ্রণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার গোরাই ব্রিজ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। গোরাই ব্রিজ কাব্যের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, এই কাব্যটি লেখক একদিনের মধ্যে রচনা করেছিলেন এবং বিষয় ভাল নয় বলে তিনি এটি প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন না। সম্ভবত এই কারণেই তিনি বসন্তকুমারী নাটককে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫]

প্রচলিত লোককাহিনীর উপাদানে সমৃদ্ধ নাটক *বসন্তকুমারী* যে কারণে আলোচিত তা হচ্ছে এটি মুসলমান নাট্যকার কর্তৃক রচিত প্রথম সার্থক নাটক। যুবতী বিমাতার যুবক সতীন পুত্রের প্রতি সমাজ নিষিদ্ধ আকর্ষণ, প্রত্যাখ্যান এবং সে প্রত্যাখ্যাত চিত্তের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বিমাতার নিষ্ঠুরতা নাটকের কাহিনী। সতীন পুত্র নরেন্দ্র, নরেন্দ্রপত্নী বসন্তকুমারী, বিমাতা রেবতী ও পিতা বীরেন্দ্র সিংহ এই চার প্রধান চরিত্রের আশ্রয়ে বিকশিত নাটকের পরিসমাপ্তি বিয়োগাত্মক। তিন অঙ্ক বিশিষ্ট ও এগার দৃশ্য সমন্বিত *বসন্তকুমারী নাটকে* সংযোজিত হয়েছে প্রস্তাবনাসহ মোট আটটি সংগীত। সংস্কৃত নাটকের আদলে পূর্বরঙ্গ বা মঙ্গলাচরণ দিয়ে বসন্তকুমারীর সূচনা। তবে তা সংস্কৃত নাটকের অন্ধ অনুসরণ নয় বরং স্বকীয়তায় ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায় মীর মশাররফ হোসেন নাটক সূচনার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে প্রখর সমাজ সচেতনার সহজাত প্রবণতাকে প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে, মনীষার প্রমাণ রেখে নির্দয় সমাজসত্যকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সমাজ সচেতনতার ইতিবাচক লক্ষণ যা তাঁর সকল নাটক ও প্রহসনের প্রধান প্রবণতা হিসেবে স্বীকৃত তাই প্রথম নাটকের সূচনাতেই লক্ষণীয়। স্থূল হাস্যরসে নাট্যারম্ভ না করে, সমাজ সংকটের অন্যতম মূল উপাদান হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বৈরিতাকে ভারতবর্ষের সর্বনাশের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি স্বীয় সমাজভাবনাকেই আলোকিত করেছেন। প্রস্তাবনায় নট-নটীর সংলাপে মুসলমান নাট্যকারের নাটক অভিনয়ের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িকতার নীচুতায় যে সামগ্রিকভাবে ভারত বিপন্ন তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে :

নটী। - ছি ছি !! অমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন।
নট। - কেন ? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো ?
নটী। - তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয় ? হাজার হোক মুসলমান।
নট। - অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্ব্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হচ্ছে।[৬]

মীর মশাররফ হোসেনের তীব্র সমাজসচেতনা পূর্বোক্ত সংলাপে প্রতিফলিত হয়েছে।

লেখক এখানে ক্ষুদ্র অথচ লক্ষ্যভেদী দুটো সংলাপের মাধ্যমে সুকৌশলে সে যুগের জাতিগত বিদ্বেষের যথার্থ চিত্র তুলে ধরেছেন। এটি তাঁর সমাজসচেতনতারই পরিচায়ক। কিন্তু এই রূপ চিত্রাঙ্কনে সাম্প্রদায়িকতার কোন উত্তাপ এতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে আছে সম্প্রীতির মধুর পরশ, দেশ ও জাতি প্রেমের উদার আকাঙ্ক্ষা। যখন মুসলমান সমাজে প্রধানত স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার লালন-পালন চলছিলো, তখন হিন্দু মুসলমানের এই মিলন কামনা মশাররফ হোসেনের সমন্বয়ধর্মী অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে।[৭]

নামকরণের মূল্যায়নে নায়িকা বসন্তকুমারী হলেও নাটকের প্রধান চরিত্র বিমাতা রেবতী। কাহিনীতে আত্মহত্যা, সহমরণ, হত্যা ও প্রাণদণ্ড এই চারের মাধ্যমে চারটি উল্লেখযোগ্য প্রাণ হরণ ঘটবার কারণে নাটকটি করুণ রসসিক্ত হলেও সফল ট্রাজিক নাটক হতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে নাট্যকারের ট্রাজেডি সম্পর্কে ধারণার অস্বচ্ছতা ও পরিমিতি বোধের অভাবই দায়ী। অনুমান করা যায়, ট্রাজেডি প্রশ্নে মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে বিস্তর প্রজ্ঞা ছিল তা মীর মশাররফ হোসেনের ছিল না। তিনি যেটুকু ধারণা অর্জন করেছিলেন তা মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটক থেকে। সংগৃহীত ধারণায় বিদ্যমান অস্পষ্টতা, *বসন্তকুমারীর* ট্রাজিক নিষ্পত্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। মৃত্যু আধিক্য, অন্তর্দ্বন্দ্বহীন চরিত্র বিকাশ, ব্যক্তিত্বহীন স্ত্রৈণ রাজা, সরল আবেগ আশ্রিত নায়িকা, পিতৃভক্ত আদর্শ যুবক, প্রখর দ্বন্দ্বময় চিত্ত বিকার পীড়িত খল নারী ইত্যাদির সমাবেশ *বসন্তকুমারীর* সমৃদ্ধি হলেও শিল্প সাফল্যের প্রমাণ রাখেনা। যে কারণে মুসলমান নাট্যকার রচিত নাটক হিসেবে *বসন্তকুমারী নাটক* নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে যে পরিমাণ গুরুত্ব পায়, নাট্য রচনার প্রাথমিককালের সৃষ্টি হিসেবে যে মর্যাদা লাভ করে, সে পরিমাণ গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রাপ্তির উপাদান এ নাটকে নাই। তবে সমাজ জিজ্ঞাসা ও নাটকের ভাষা এ নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। পূর্বেই মীর মশাররফ হোসেনের সমাজ সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া গেল নট-নটীর সংলাপে, প্রস্তাবনা অংশে। এছাড়া *বসন্তকুমারী নাটক* যে কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তাকে আপাতত রাজকীয় আবহের বলে মনে হয়। রাজ পরিবারের অন্দর মহলের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা কাহিনীর প্রাণ। রানী রেবতীর প্রণয় আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ও প্রত্যাখ্যানহেতু খল মূর্তিতে আবির্ভাব কাহিনীকে গতি দিয়েছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিকৃত রুচির রেবতী নাটকীয় প্রাণকে সজীব করে রেখেছে। তার রাজার প্রতি বিকর্ষণ ও যুবরাজ নরেন্দ্রের প্রতি তীব্র আকর্ষণ নাটকের মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করে *বসন্তকুমারী নাটককে* নিয়ে গেছে অনিবার্য পরিণতির পথে। এ সকল বিবেচনা নাটকের কাহিনীর বাহ্য অঙ্গের। কিন্তু অন্দর অঙ্গের বিবেচনায় দেখা যাবে *বসন্তকুমারী* সামন্ত সমাজের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের একটি নিষ্ঠুর সত্যকে এবং চিরকালীন মানব চিত্তের দুর্জ্ঞেয় নির্দয় বাসনাকে উদ্ভাসিত করেছে। নিষ্ঠুর সত্য ও নির্দয় বাসনা উপস্থাপনের কারণেই এ নাটক আলোচিত ও বিবেচিত হওয়া উচিত।

বসন্তকুমারী নাটকের কাহিনীর ভেতরই আছে নিষ্ঠুর সত্য ও নির্দয় বাসনার প্রতিফলন। কাহিনীতে দেখা যায় ---

> বীরেন্দ্র সিংহ ইন্দ্রপুরের রাজা। তিনি বিপত্নীক। তাঁর ইচ্ছা, যুবরাজ নরেন্দ্রের বিবাহ প্রদান করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু বিদূষক প্রিয়ম্বদের প্ররোচনায় যুবরাজের বিবাহ বিলম্বিত করে রাজা স্বয়ং বৃদ্ধাবস্থায় রেবতী-নাম্নী এক সুন্দরী তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন। রাজার এই 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' গ্রহণ রাজ্যে বিশেষ নিন্দা, সমালোচনা ও হাস্য-পরিহাসের অবতারণা করে।
>
> নতুন রানী রেবতী শিথিল চরিত্রের রমণী। সে সুদর্শন যুবরাজ নরেন্দ্রের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। প্রথমে দূতী দাসী ও পরে পত্রের মাধ্যমে রানী প্রণয় প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু রানীর সম্পর্কের শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী অনৈতিক প্রণয় নিবেদন নরেন্দ্র প্রত্যাখ্যান করে।
>
> এদিকে ভোজপুরের রাজা বিজয় সিংহের কন্যা বসন্তকুমারী স্বপ্নে যুবরাজ নরেন্দ্রকে দর্শন করে তাকে লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। উৎকণ্ঠিত রাজা সকল বৃত্তান্ত অবহিত হয়ে স্বয়ম্বর-সভার ব্যবস্থা করে। বসন্তকুমারীর চিত্রপট দর্শনে তার প্রতি আকৃষ্ট নরেন্দ্রও আমন্ত্রিত হয়ে স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত বসন্তকুমারী তার আকাঙ্ক্ষিত জনকেই পতিত্বে বরণ করে।

রানী রেবতী তার কুবাসনা চরিতার্থ করতে না পেরে নরেন্দ্রকে জব্দ করার ফন্দি আঁটতে থাকে। নরেন্দ্রের বিবাহ তাকে আরো বেশি ঈর্ষান্বিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। রাজার নিকটে রানী রেবতী তার সতীত্বনাশ চেষ্টার মিথ্যা অভিযোগ আনে নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে। স্ত্রৈণ রাজা রেবতীর এই কপটতা ও ষড়যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করে। রানীর ইচ্ছানুসারে রাজা বীরেন্দ্র যুবরাজকে অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দণ্ড প্রদান করে। নির্দোষ যুবরাজ পিতৃ-নির্দেশ মান্য করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে এবং নব পরিণীতা পত্নী বসন্তকুমারীও তার অনুগামী হয়। যুবরাজের সস্ত্রীক আত্ম-বিসর্জনের পরপরই রাজা বীরেন্দ্র যুবরাজকে লিখিত রেবতীর প্রণয় পত্র পাঠ করে সমুদয় বিষয় অবহিত হয়। রাজা তৎক্ষণাৎ পাপিষ্ঠা রানীকে হত্যা করে। অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে জর্জরিত, নির্দোষ পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত রাজা বীরেন্দ্রও নিজের ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্তের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয় বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাই যে এই মর্মান্তিক পরিণতির মূল কারণ এই কাহিনী তা-ই নির্দেশ করে।[৮]

নাটকের নিষ্ঠুর সত্য হচ্ছে বৃদ্ধের সদ্য যৌবন-উদ্ভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ। উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজে যে সকল নষ্ট প্রবণতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল বিত্তশালী ব্যক্তিদের অল্পবয়স্ক নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ। একাধিক বিবাহের মতো তরুণী ভার্যা গ্রহণ এক ধরনের মানসিক ও যৌন বিকৃতি। এই বিকৃতি সেকালের সমাজ অভ্যন্তরে ব্যাপক ছিল এবং সমাজ সংস্কারের দৃষ্টিতে তা কখনোই কদর্য ছিল না। মশাররফ-পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে এই কদর্যের বিস্তৃতি লক্ষণীয়। *বসন্তকুমারী নাটকের* আরেকটি নিষ্ঠুর সত্য হচ্ছে, শাসক শ্রেণীর প্রাসাদ অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্র ও তার পরিপ্রেক্ষিতে দমন, পীড়ন। প্রেমের কারণে, অবাধ্যতার কারণে কিংবা ক্ষমতার কর্তৃত্ব প্রশ্নে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীর উৎপীড়নের মাত্রা এতই প্রকট ছিল যে তাকে শাসন না বলে নির্মম, নিষ্ঠুর অত্যাচার বলাই শ্রেয়। বিত্তশালীর চিত্তবিলাস যৌন বিকৃতি ও ক্ষমতার একচ্ছত্র আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে রাজা বীরেন্দ্র যা করেছেন তা সমকালীন সমাজজীবনেরই নিষ্ঠুর চিত্র। প্রিয়দর্শিনী তরুণী রেবতীকে স্ত্রী হিসেবে বরণের মধ্যে এবং নরেন্দ্রকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মধ্যে বিত্তশালী শ্রেণীর সমকালীন সমাজ সত্যের বাস্তব অথচ নিষ্ঠুর সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গীয় সমাজ স্কন্ধে উপবিষ্ট এই কদর্য বোঝা অপসারণের মানসে মীর মশাররফ হোসেন লেখনী ধারণ করেছিলেন। *বসন্তকুমারী নাটক* কদর্য ও মর্মান্তিক সত্যকে আলোকিত করেছে এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রান্তসীমায় উপনীত বঙ্গীয় সমাজকে স্পষ্ট করেছে। এই নিষ্ঠুর সত্য চিত্রাঙ্কন এ নাটককে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে।

বসন্তকুমারী নাটকের আরেকটি বিশিষ্ট দিক এর চিরকালীন মানবচিত্তের দুর্জ্ঞেয় নির্দয় বাসনা চিত্রায়ণ। এ চিত্রায়ণে নাট্যকার এমন এক নিষিদ্ধ প্রেমকে আশ্রয় করেছেন যা *বসন্তকুমারীর* পূর্বে বাংলা নাটকে লক্ষ করা যায় না। বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী গ্রহণ, একাধিক বিবাহ বঙ্গীয় সমাজের তৎকালীন স্বাভাবিক চিত্র। তবে যুবতী বিমাতার যুবক সতীন পুত্রের প্রতি প্রণয়, কাম উন্মাদনা, প্রতিহিংসাপরায়ণা নারীর নির্মমতা, মীর মশাররফ হোসেনের হাতে প্রথম সার্থকতা লাভ করে। *ইডিপাস* নাটকে জোকাস্টা ও ইডিপাসের দৈব নির্দিষ্ট পরিণয় ও সন্তান লাভের মধ্যে নায়ক-নায়িকার ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। মাতা-পুত্রের নিষিদ্ধ সম্পর্ক বিকাশে নিয়তি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। চরিত্রসমূহ অজ্ঞাতে অগ্রসর হয়েছে পরিণয়ে। তাদের পক্ষে অনিবার্য পরিণতি রোধ করা সম্ভব ছিল না। সেখানে নিয়তি নির্ধারিত মানবভাগ্য সুগভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। রাজা লেয়াস অবগত থাকবার পরও পরিণতি প্রতিরোধে সক্ষম হননি। তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কিন্তু *বসন্তকুমারী নাটকে* মাতা-পুত্রের

সম্পর্ক ইডিপাস নাটকের মত অতদূর অগ্রসর হয়নি। কিংবা নিয়তি অপ্রতিরোধ্যও নয়। তারপরও যা ঘটেছে তা বাংলা নাট্য সাহিত্যে যেমন বিরল তেমনি সমাজ বিশ্লেষণেও অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অসম বিবাহ ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য ও যৌন বিকৃতির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সকল সময়েই এই পরিণয় সুস্থ ও স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন নির্বাহে সহায়তা করবে এমনটি প্রত্যাশা করা যায় না। আর যায় না বলে সমাজে তা অনেক সময় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গার্হস্থ্য জীবন ও সমাজ জীবন অসম পরিণয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারই প্রমাণ রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন মীর মশাররফ হোসেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন।

অসম পরিণয়ে বিপন্ন গার্হস্থ্য জীবনে ও তার সমাজ জীবনে ঋণাত্মক প্রভাব কত গভীর *বসন্তকুমারী নাটক* সে সাক্ষ্য দেয়। নাটকে দেখা যায়, এই অবিবেচনাপ্রসূত পরিণয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় রাজা বীরেন্দ্র সিংহের সংসার। বিপুল সম্ভাবনাময় পরিবার ও রাজ উত্তরাধিকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রানী রেবতীর কাম-উন্মাদনাজাত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা বঙ্গীয় সমাজ দৃষ্টিতে নৈতিকতাবর্জিত কিন্তু তা যে স্বাভাবিক সে কথাই স্পষ্ট করা হয়েছে নাটকে। রেবতীর সংলাপে তার অতৃপ্ত চিত্তের প্রকাশ লক্ষ করা যায় এবং অসম পরিণয়ের ফলে সৃষ্ট মানবিক সংকটই কাহিনীর কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান করেছে। *বসন্তকুমারী নাটকের* প্রথম অঙ্কের পঞ্চম রঙ্গভূমিতে রেবতী বলে, "রাজা আমায় দেখে একেবারে ভুলে গেছেন, কিন্তু আমায় ভুলাতে পারেননি।... মন যারে ভালবাসে না, চোক তারে ভালবাসবে কেন ?... তার যৌবন অবস্থা মধ্যম অবস্থা গিয়ে এখন শেষ অবস্থারও শেষে ঠেকেছে, আমার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ। এতে মনের মিল হবে কেন ? আমি বা তাকে ভালবাসবো কেন ? মণিমুক্তা আর ভাল ভাল গয়না ভাল ভাল কাপড় দিলেই যে ভালবাসা হয়, তা নয়, ভালবাসার অঙ্গ অনেক।"

অর্থ বিত্ত ও প্রতিপত্তি সামন্ত সমাজের নিয়ন্ত্রক। এমনকি ভালবাসারও। হৃদয়ের উষ্ণতা, বিত্তের উত্তাপে প্রকাশিত হয়। প্রণয়হীন পরিণয়ে নারী আবদ্ধ থাকে সংসার শৃঙ্খলে। তার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি পুরুষের মর্জির ওপর নির্ভর করে। প্রণয়ে ব্যক্তি নারী লুপ্ত থাকে। এই ছিল সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ। কিন্তু *বসন্তকুমারী নাটকে* রেবতী চরিত্র সামন্ত সমাজের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ নয় তবে সামন্ত সমাজ অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল মূল্যবোধে ভাঙনের সূচনা করে। সঙ্গত কারণে অসম পরিণয়ের ঋণাত্মক প্রভাব, বঙ্গীয় সমাজের এই প্রবণতাকে সামান্য হলেও আঘাত করে। আর এখানেই *বসন্তকুমারী নাটকের* যথার্থ কৃতিত্ব।

বসন্তকুমারী নাটক আরও একটি কারণে বিশিষ্টতা দাবি করে। তা হলো মানবচিত্তের দুর্জ্ঞেয় নির্দয় বাসনা। পূর্বেই বলা হয়েছে সামন্ত সমাজে নারী যন্ত্রতুল্য পণ্য। পুরুষের আকাঙ্ক্ষার দ্রব্য। তার নিজস্ব সত্তা বলে কিছু ছিলনা। নারীর মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ অপ্রকাশিত থাকতো। পুরুষ সমাজের সামন্ত মানসিকতার কর্তৃত্বের কাছে প্রত্যহ বলি হতো তারা। ক্রীত পণ্যের মতো, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মতো, স্বকীয়তা শূন্য জড় অস্থিতে বসবাস করতো নারী। সে নারীর হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়া বাংলা নাটকে বরাবরই ছিল অনুপস্থিত। উপেক্ষিত নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক কামনা-বাসনা যা দুর্জ্ঞেয় ও নির্দয় তাকে প্রকাশ করেছেন মীর মশাররফ হোসেন। মীর মশাররফ হোসেন প্রথম নারী হৃদয়ের এই গোপন রহস্যকে বাংলা নাটকে *বসন্তকুমারীর* মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

রেবতী ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিকৃত রুচির এক রমণী। তার চরিত্রে কপটতা, অপকৌশল, প্রতিহিংসা ও অমানবিক হিংস্রতার পরিচয় মেলে। বৃদ্ধ রাজার প্রতি যৌবন ধর্মের স্বাভাবিক কারণেই সে বীতরাগ একদিকে তার বিকর্ষণ রাজার প্রতি, অপরদিকে গভীর আকর্ষণ বোধ করে সে যুবরাজের প্রতি। শরীর ও মনোধর্মের কারণেই রেবতী সুদর্শন যুবরাজ নরেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার এই প্রণয়-পথ নিষ্কন্টক ছিলো না তাই নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ কামনায় তাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। রাজাকে বিভ্রান্ত, বশীভূত ও তার সঙ্গে দূরত্ব-রচনার জন্য সে কপট মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়। নরেন্দ্রের প্রত্যাখ্যান ও বিবাহ তাকে প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তোলে। নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে সম্ভ্রম হানির মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে তার চরম শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।... রেবতীর নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে নরেন্দ্র-বসন্তকুমারীর করুণ মৃত্যু হয় ... রক্ত মাংসের মানুষের কামনা-বাসনার কদর্য রূপের প্রকাশ আছে রেবতীর চরিত্রে। ... বিরংসা শাসিত তার চরিত্রে মহৎ উপলব্ধির সুযোগ নেই। অনিয়ন্ত্রিত যৌবন ধর্মের প্রবল স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে সে এক অসহায় নারী।[৯]

রেবতী চরিত্রের এই মূল্যায়ন নাট্যকার কর্তৃক সৃষ্ট কাহিনীর বাহ্য আবরণের আলোকে বর্ণিত। বঙ্গীয় সমাজভাবনার প্রথাগত বিচার মাত্র। কিন্তু তার চরিত্রের অন্তর্গত তীক্ষ্ণ দ্রোহ প্রধানত আঘাত করেছে প্রচলিত সমাজ রীতিকে। মূল্যবোধ লালিত বিশ্বাসে রেবতীকে কোনভাবেই উৎকৃষ্ট দাবি করা উচিত নয়। তাকে মন্দ চরিত্র হিসেবেই বিবেচনা করা সঙ্গত। কিন্তু যে সমাজ বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধ অসম পরিণয়কে সহসা স্বীকৃতি দেয়, রেবতী সেই বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধকে আঘাত করেছে। আর সে কারণে দ্রোহী নারী হিসেবে তার প্রাপ্য মর্যাদা বাংলা নাটকে উচ্চারিত হবে। রেবতীর তীব্র কামনায় যেমন যৌন বিকার সক্রিয় তেমনি সমাজ অভ্যন্তরে সংক্ষুব্ধ নারীর প্রতিবাদের সূচনা হয়েছে। রেবতীর পূর্বে বাংলা নাটকে পাওয়া যায় সুভদ্রা[১০] শর্মিষ্ঠা[১১] কৃষ্ণকুমারী[১২] ক্ষেত্রমণি[১৩] সহ অসংখ্য নারী চরিত্র। কিন্তু তারা কেউই দ্রোহী নয়। সমাজ-সংসারের প্রচলিত সংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এরা। এদের জীবনের সংকটকে এরা কখনো নিয়তি কিংবা সমাজ শাসন বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে সংগ্রাম করেনি। এ বিবেচনায় বাংলা নাটকে রেবতী, সামন্ত মূল্যবোধ লালিত বঙ্গীয় সমাজে নারীর স্বাধীন চিত্তের প্রথম রুদ্র প্রকাশ। আর *বসন্তকুমারী নাটক* অবহেলিত নারী হৃদয়ে ভারাক্রান্ত সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরে প্রথম দ্রোহ।

তথ্যসূত্র

১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), ৬ষ্ঠ সংস্করণ মাঘ ১৩৮৯, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ২৯৪

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১-৩০২

৩. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজ চিন্তা*, আগস্ট ১৯৯৬ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১১

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

৫. সেলিম জাহাঙ্গীর, *মীর মশাররফ হোসেন : জীবন ও সাহিত্য*, জুন ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯৩

৬. কাজী আবদুল মান্নান, *মশাররফ রচনা সম্ভার* (প্রথম খণ্ড), ১৯৭৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১১০

৭. সেলিম জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত পৃ. ৯৫

৮. আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৮

১০. সুভদ্রা = তারাচরণ শিকদার রচিত *ভদ্রার্জুন* নাটকের নারী চরিত্র।

১১. শর্মিষ্ঠা = মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত *শর্মিষ্ঠা* নাটকের নারী চরিত্র।

১২. কৃষ্ণকুমারী = মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের নারী চরিত্র।

১৩. ক্ষেত্রমণি = দীনবন্ধু মিত্র রচিত *নীলদর্পণ* নাটকের নারী চরিত্র।